بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ মোতাবেক ২০ তবলীগ, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে গতকাল থেকে রমযান মাস আরম্ভ হয়েছে। রোযার এই মাসটি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে বিশেষভাবে আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং নিজেদের আধ্যাত্মিক সংশোধনের জন্য দান করেছেন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে এই মাস থেকে সর্বাধিক কল্যাণ লাভের তৌফিক দিন। কিন্তু সর্বদা এটি স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রকৃত কল্যাণ তবেই অর্জিত হবে যদি রমযানের পরও আমরা আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসা ও ইবাদতের মান বজায় রাখি, বরং তা আরো উন্নত করার চেষ্টা করি; তবেই আমরা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যও পূর্ণকারী হতে পারব।

আপনারা জানেন, আমি বিগত কয়েক জুমুআ থেকে মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার প্রতি ভালোবাসা, ইবাদতের রীতি ও মান এবং মু'মিনদেরকে এর ওপর আমল করার জন্য তিনি যে উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করেছেন– সে সম্পর্কে বর্ণনা করে আসছি। আর এরপর তাঁর (সা.) একনিষ্ঠ দাস [মসীহ্ মওউদ (আ.)]-এর মহানবী (সা.)-এর সর্বোত্তম আদর্শের প্রকৃত অনুসরণের ঘটনাবলি বর্ণনা করেছিলাম। এই বিষয়টি এখনও চলমান আছে এবং আজ রমযানের প্রেক্ষাপটেও এটিই চলমান থাকবে। আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পুণ্যময় জীবনচরিত থেকে এই বিষয়েই কিছু ঘটনা বর্ণনা করব, যেগুলোতে আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁর সম্পর্ক এবং দোয়ার প্রতি তাঁর মনোযোগের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এটিও আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ যে, মনিব ও দাসের ইবাদত এবং ঐশী ভালোবাসার এসব ঘটনার বর্ণনায় তিনি আমাদেরকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন যে, আমরা রমযান মাসে প্রবেশ করেছি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা নিজেদের অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্তে আত্মপর্যালোচনা করার সুযোগ পাচ্ছি এবং পেতে পারি। সুতরাং আমি যে ঘটনাগুলো বর্ণনা করব বা করে আসছি, আমাদের প্রত্যেকের উচিত নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নয়ন এবং আত্মপর্যালোচনার জন্য সেগুলোকে নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা। সেইসাথে আমাদের সর্বদা সেই সব কথা ও কর্ম অনুসারে চলার চেষ্টা করা উচিত যেগুলো আমাদের মনিব হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠ দাসের (আ.) ইবাদতের পদ্ধতি ছিল বা আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁদের সম্পর্ক ছিল। এমন যেন না হয় যে, আমরা কেবল এই ঘটনাগুলো শুনব এবং আনন্দিত হব; বরং এগুলো আমাদের জন্য পথনির্দেশক হওয়া উচিত।

ঘটনাবলির মাঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের একটি রেওয়ায়েত বা বর্ণনা উপস্থাপন করছি। তিনি মুকাররম মৌলভী মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ্ বাটালভী সাহেবের একটি বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি জানান, এটি সম্ভবত ১৯০৭ সালের কথা, একবার মরহুম কাজী জিয়াউদ্দীন সাহেবের কন্যা আমাতুর রহমান সাহেবা, যিনি সম্পর্কে আমার নানাবাড়ির আত্মীয়াও ছিলেন, তিনি আমাকে কাগজের

একটি টুকরো দেন, যা জঞ্জাল বা ফেলনা কাগজের মতো ছিল। কিন্তু যেহেতু এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং হযরত উম্মুল মু'মিনীন-এর নিজ হাতে লেখা বাক্য ছিল, তাই আমি বরকত লাভের উদ্দেশ্যে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তা হস্তগত করি এবং সংরক্ষণ করি। এরপর তিনি বলেন, কোনো এক সময় এটি আমার হাত থেকে এদিক-সেদিক হয়ে যায় বা কোনো বইয়ের ভেতর রয়ে যায়। কিন্তু যা-ই হোক, যেহেতু এর সাথে একটি ঘটনার সম্পর্ক রয়েছে যা আমাতুর রহমান সাহেবা নিজে আমাকে শুনিয়েছিলেন, তাই ওই কাগজের টুকরোতে– যা দৃশ্যত একটি ফেলনা কাগজ ছিল– যাতে অকৃত্রিমভাবে লেখা সেই বাক্যের মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক, তাকওয়া, পবিত্রতা এবং ইবাদতের প্রতি অনুরাগের স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। তিনি বলেন, এ কারণেই আমি এর উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করছি। আমাতুর রহমান সাহেবা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বাড়িতে থাকতেন তখন তিনি দেখেছিলেন এবং তিনি আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, একদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং হযরত উম্মুল মু'মিনীন পরীক্ষা করে দেখতে চাইলেন– দেখা যাক, চোখ বন্ধ করে কাগজের ওপর লেখা যায় কি না। নিজেদের মধ্যকার ঘরোয়া পরিবেশে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে এই পরীক্ষা চলছে। সুতরাং কাগজের সেই টুকরোটি হাতে নিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর ওপর এই বাক্যটি লেখেন, যা আমার অক্ষরে অক্ষরে মনে আছে। যদিও কাগজটি হারিয়ে গেছে, কিন্তু আমার তা স্মরণ আছে এবং আমি অত্যন্ত দৃঢ় আস্থার সাথে বলতে পারি, যদি কখনো সেটি পাওয়াও যায়– এ বাক্যই তাতে লেখা থাকবে। হুযূর (আ.) চোখ বন্ধ অবস্থায় যা লিখেছিলেন তা হলো, 'মানুষের উচিত সর্বক্ষণ খোদা তা'লাকে ভয় করা এবং পাঁচবেলা তাঁর দরবারে দোয়া করতে থাকা।'

সুতরাং, এটিই হলো সেই মান, যা তিনি (আ.) সর্বদা তাঁর অনুসারীদেরকে অর্জন করার শিক্ষা দিয়েছেন। সর্বদা তাঁর (আ.) কেবল এই চিন্তাই থাকত যে, আমার অনুসারীরা, বরং প্রত্যেক মু'মিন যেন এমন হয় যার মাঝে খোদাভীতি বিদ্যমান এবং সে সর্বদা ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধকারী হয়।

যাহোক, ওই কাগজের ওপর হযরত আম্মাজানেরও যে লেখা ছিল, আমি সেটিও বর্ণনা করে দিচ্ছি, যা সাধারণ ঘরোয়া বিষয় সম্পর্কিত ছিল। হযরত আম্মাজানের সরল বাক্যটি ছিল, 'মাহমুদ আমার আদরের ছেলে, কেউ যেন তাকে কিছু না বলে।' আর এরপর সন্তানদের সম্পর্কেই আরেকটি বাক্য ছিল যে, 'মুবারক আহমদ বিস্কুট চায়।' তো যা-ই হোক, এগুলোই ছিল দুইজনের লেখা। এগুলো সাধারণ ঘরোয়া কথা ছিল যা তিনি লিখেছিলেন।

তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লেখা যদিও ভাঙাভাঙা ছিল, কিন্তু তা স্পষ্ট ছিল। যদিও চোখ বন্ধ করে তা লেখা হয়েছিল, মনে হচ্ছিল যেন টেনে টেনে লেখা হয়েছে, কিন্তু তা স্পষ্ট ছিল এবং তা পাঠোদ্ধার সম্ভব ছিল। চোখ বন্ধ করে লেখা সত্ত্বেও, অন্যান্য লেখার মতোই এর লাইনগুলো সোজা ছিল; যেভাবে সাধারণ লেখায় মানুষ সোজা লাইনে লেখে– তা ঠিক ছিল, একেবারে সোজা লাইন ছিল। কিন্তু হযরত উম্মুল মু'মিনীনের অক্ষরগুলো ওপর-নীচ হয়ে গিয়েছিল এবং লাইনও সোজা থাকে নি। লেখাটি কী ছিল তা তো জানা গেল। যে বিশেষ কথাটি যা সর্বদা আনন্দিত করে আর এটি সত্যিই আনন্দের বিষয় যে, নিজ ঘরে অত্যন্ত অকৃত্রিম পরিবেশে বসে থাকা অবস্থাতেও যদি হঠাৎ না ভেবেচিন্তে হুযূর (আ.)-কে কোনো কথা লিখতে হয়, তবে তা উপদেশমূলক বাক্য ছাড়া

আর কিছুই তাঁর মনে আসে নি। অন্যদিকে হযরত উম্মুল মু'মিনীনের লেখাটি এমন ছিল, যা সেই পরিবেশ অনুযায়ী তাঁর মনে আসা স্বাভাবিক ছিল। এরপর তিনি যা লিখেছেন তা ছিল এক বাস্তব সত্য। তিনি লেখেন, এটিই হলো সেই পার্থক্য যা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ মানুষের মাঝে হয়ে থাকে। তাঁর (আ.) হৃদয়ে এই ব্যাকুলতা ছিল যে, কীভাবে মানুষকে খোদা তা'লার নিকটবর্তী করা যায় এবং তাদের মাঝে ইবাদতের স্পৃহা জাগ্রত করা যায়।

বস্তুত এটি ঘরোয়া পরিবেশের একটি অত্যন্ত সাদামাটা ঘটনা, কিন্তু এর মাঝে অনেক গভীর শিক্ষণীয় বিষয় নিহিত রয়েছে।

একইভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সানৌরী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ১৮৮৪ সালে ইচ্ছা পোষণ করেন যে, কাদিয়ান থেকে বাইরে কোথাও গিয়ে 'চিল্লা' বা 'নির্জন সাধনা' করবেন এবং ভারতবর্ষও ভ্রমণ করবেন। সুতরাং তিনি (আ.) গুরুদাসপুর জেলার সুজানপুরে গিয়ে নির্জনে থাকার সংকল্প করেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ (রা.) বলেন, এ বিষয়ে হুযূর (আ.) নিজের হাতে লেখা একটি পোস্টকার্ড আমার কাছে পাঠান। তখন আমি নিবেদন করলাম, আমাকেও যেন এই সফরে এবং ভারতবর্ষের সফরে সাথে রাখা হয়। হুযূর (আ.) তা মঞ্জুর করেন। কিন্তু এরপর সুজানপুর সফরের বিষয়ে হুযূরের (আ.) প্রতি এলহাম হয়, 'তোমার সমস্যার সমাধান হুশিয়ারপুরে হবে।' সুতরাং তিনি সুজানপুর যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করেন এবং হুশিয়ারপুর যাবার সংকল্প করেন। ১৮৮৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি (আ.) যখন হুশিয়ারপুর যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন হুযূর (আ.) আমাকে [অর্থাৎ মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্‌কে] চিঠি লিখে কাদিয়ান যেতে বলেন। আর হুশিয়ারপুরের রঈস শেখ মেহের আলী সাহেবকে চিঠি লেখেন, **আমি দুই মাসের জন্য হুশিয়ারপুর আসতে চাচ্ছি। শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত এমন কোনো একটি বাড়ির ব্যবস্থা করে দিন, যেটি দ্বিতল হবে। [বাড়িটি যেন দোতলা হয় এবং শহরের বাইরে হয়।]** শেখ মেহের আলী সাহেব নিজের একটি বাড়ি, যেটি 'তাভীলা' নামে সুপরিচিত ছিল, সেটি খালি করে দেন। হুযূর (আ.) ছোটো গরুর গাড়িতে বসে, বিপাশা নদীর পথ ধরে যাত্রা করেন। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বলেন, আমি, শেখ হামেদ আলী এবং ফতেহ্ খান সাহেব সাথে ছিলাম। ফতেহ্ খান, হুশিয়ারপুর জেলার টান্ডা সংলগ্ন রসূলপুরের বাসিন্দা ছিল এবং হুযূর (আ.)-এর একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, পরবর্তীতে সে মৌলভী মুহাম্মদ হুসাইন বাটালভীর খপ্পরে পড়ে মুরতাদ হয়ে যায়। হুযূর (আ.) নদীর তীরে পৌঁছার পর নদী পার হবার জন্য নৌকা নেন; নৌকা যখন চলছিল তখন হুযূর (আ.) আমাকে সম্বোধন করে বলেন, **মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্! কামিল (পুণ্যবান) ব্যক্তির সাহচর্য এই নদীভ্রমণের মতো, যা পার হবার আশা থাকে, আবার ডুবে যাবার আশঙ্কাও থাকে।** [অর্থাৎ কামিল বা পুণ্যবান ব্যক্তি, বুযুর্গ বা ওলীউল্লাহ্‌র সাহচর্যে থাকা মানুষের পরিণতি উভয় প্রকার হতে পারে। হয়ত সে পারও হয়ে যেতে পারে, আবার যেমনটি আমরা নদীতে নৌকায় করে যাচ্ছি, এই নৌকা আমাদের নিমজ্জিতও করতে পারে।] তিনি বলেন, আমি হুযূর (আ.)-এর এই কথাটি (তখন) ভাসা ভাসা শুনেছিলাম, কিন্তু ফতেহ্ খান যখন মুরতাদ হয়ে যায় তখন আমার হযরত সাহেবের এই কথাটি মনে পড়ে। যাহোক, তিনি বলেন, আমরা পথিমধ্যে ফতেহ্ খানের গ্রামে যাত্রাবিরতি করে পরের দিন হুশিয়ারপুর পৌঁছি। সেখানে পৌঁছানোর পরপরই হযরত সাহেব (আ.) তাভীলার দোতলায় অবস্থান গ্রহণ করেন। আর আমাদের

মাঝে যেন কোনো বিবাদ না হয়, সেজন্য আমাদের তিনজনের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেন। আমার দায়িত্ব ছিল রান্নাবান্নার। ফতেহ্ খানের দায়িত্ব ছিল বাজার থেকে সদাই ইত্যাদি নিয়ে আসা। শেখ হামেদ আলীর দায়িত্ব ছিল ঘরের দৈনন্দিন কাজগুলো করা আর আগন্তুকদের আতিথ্য করা। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাতে লেখা বিভিন্ন বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঘোষণা করেন, **চল্লিশ দিন পর্যন্ত কেউ যেন আমার সাথে দেখা করতে না আসেন এবং কেউ যেন আমাকে নিমন্ত্রণ না করেন। এই চল্লিশ দিন অতিবাহিত হবার পর আমি এখানে আরো বিশ দিন অবস্থান করব। এই বিশ দিনে যারা সাক্ষাৎ করতে চান তারা সাক্ষাৎ করতে পারবেন, যারা নিমন্ত্রণ জানানোর ইচ্ছা রাখেন তারা নিমন্ত্রণ করতে পারবেন এবং যারা প্রশ্নোত্তরের বাসনা রাখেন তারা প্রশ্নোত্তর করতে পারবেন।**

হযরত সাহেব (আ.) আমাদেরকেও নির্দেশ দেন, দেউড়ির (তথা সদর দরজার) ভেতরের শিকল যেন সর্বদা লাগানো থাকে, [অর্থাৎ দরজা যেন ভেতর থেকে আটকানো থাকে,] আর ঘরের ভেতরেও কেউ যেন আমাকে না ডাকে। আমি যদি কাউকে ডাকি, তবে সে যেন কেবল ততটুকুই আমার কথার উত্তর দেয় যতটুকু প্রয়োজন। দোতলায় কেউ যেন আমার কাছে না আসে। [ওপরের তলায় যেখানে তিনি (আ.) অবস্থান করছিলেন, সেখানে যেন অন্য কেউ না যায়।]

তিনি বলেন, আমার দায়িত্ব ছিল তাঁর খাবার ওপরে পৌঁছে দেওয়া। আর তিনি (আ.) বলেছিলেন, **আমার খাবার ওপরে পৌঁছে দেবে, কিন্তু আমার খাবার খাওয়ার জন্য যেন অপেক্ষা না করা হয়। খালি বাসনপত্র পরে অন্য কোনো সময়ে নিয়ে যেয়ো। আমি আমার নামায ওপরেই পড়ব, [কারণ আমি চিল্লা পালন করছি, তাই আমি ওপরেই নিজের নামায পড়ব;] আর তোমরা নীচে একত্রে পড়ে নিয়ো।** জুমুআর জন্য তিনি (আ.) বলেন, **জুমুআ পড়া যেহেতু আবশ্যক, তাই কোনো নির্জন মসজিদ খুঁজে বের করো, যা শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত হবে আর যেখানে আমরা পৃথকভাবে নামায পড়তে পারব।** শহরের বাইরে একটি বাগান ছিল, সেখানে একটি ছোট্ট পরিত্যক্ত মসজিদ ছিল। জুমুআর দিন হুযূর (আ.) সেখানে যেতেন এবং আমাদেরকে নামায পড়াতেন আর খুতবাও তিনি নিজেই দিতেন।

মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করতেন, আমি খাবার রেখে আসার জন্য ওপরে যেতাম কিন্তু হুযূর (আ.)-এর সাথে কোনো কথা বলতাম না। তবে হুযূর (আ.) নিজে কখনও আমার সাথে কোনো কথা বললে (তার) উত্তর দিতাম মাত্র। একবার হযরত সাহেব (আ.) আমাকে বলেন, **মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্! এই দিনগুলোতে আমার প্রতি খোদা তা'লার কৃপার বড়ো বড়ো দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে এবং কখনো কখনো দীর্ঘ সময় ধরে খোদা তা'লা আমার সাথে কথা বলা অব্যাহত রাখেন। যদি এসব ঘটনা লিপিবদ্ধ করা হয়, তাহলে তা অনেক পৃষ্ঠা হয়ে যাবে।**

মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বলেন, প্রতিশ্রুত পুত্র সম্পর্কিত বিভিন্ন এলহামও এই চিল্লাতেই হয়েছিল এবং চিল্লা শেষ হবার পর হুশিয়ারপুর থেকেই তিনি (আ.) এই ভবিষ্যদ্বাণীর ঘোষণা প্রদান করেছিলেন। এটি ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬ সালের বিজ্ঞপ্তি, যা জামা'তে **'পেশগোয়ী মুসলেহ্ মওউদ'** (বা মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী) নামেও পরিচিত।

এটিও এক বিশেষ কাকতালীয় ব্যাপার, আজ ২০শে ফেব্রুয়ারি এবং প্রতিশ্রুত পুত্র সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী অত্যন্ত মহিমার সাথে পূর্ণ হবার দিনও বটে। সেই প্রতিশ্রুত পুত্র,

যিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুযায়ী জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বায়ান্ন বছর যাবৎ তাঁর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বহু সাফল্যে ভূষিত করেছেন। মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণীতে যেসব কথা, এলহাম এবং প্রতিশ্রুতি ছিল– সেগুলো সবই হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ (রা.)-র সত্তায় পূর্ণ হয়েছিল। আর আমি এটিকে কাকতালীয় এ জন্য বলছি যে, এই ঘটনাটি আজকের দিনেই আমার সামনে এসেছে, নতুবা এটি আগে-পরেও আসতে পারত। কিন্তু ঐশী প্রজ্ঞার অধীনে এটি আজকের দিনেই সামনে আসা এবং বর্ণনা করা নির্ধারিত ছিল।

২০শে ফেব্রুয়ারির প্রেক্ষাপটে, যা **'মুসলেহ্ মওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্‌বাণী' দিবস**, এই ঘটনার পটভূমিও বর্ণিত হয়ে গেল যে, কীভাবে তিনি [হযরত মসীহ্ মসীহ্ (আ.) হুশিয়ারপুর] যান, চিল্লাকাশি করেন এবং সেখানে তাঁকে বিভিন্ন সুসংবাদ প্রদান করা হয়। আজকাল জামা'তে এ উপলক্ষ্যে জলসাও অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে (জামা'তের) ইতিহাসও জানা যায়। এমটিএ-তে অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হচ্ছে, সেগুলো থেকেও জানা যায়; সেগুলো দেখা উচিত।

যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, যখন চল্লিশ দিন অতিবাহিত হয়, তখন তিনি (আ.) ঘোষণা অনুযায়ী আরো বিশ দিন সেখানে অবস্থান করেন। এই দিনগুলোতে অনেক মানুষ (তাঁকে) নিমন্ত্রণ করেন, অনেকেই ধর্মীয় মতবিনিময়ের জন্য আসেন এবং বাইরে থেকে হুযূর (আ.)-এর পূর্বপরিচিত লোকজনও অতিথি হিসেবে আসেন। এই দিনগুলোতেই মুরলিধরের সাথে তাঁর (আ.) মুবাহাসা (বা ধর্মীয় বিতর্ক) অনুষ্ঠিত হয়, যা **'সুরমা চশমায়ে আরিয়া'** গ্রন্থে লিপিবদ্ধ রয়েছে। দুই মাসের মেয়াদ পূর্ণ হবার পর হযরত সাহেব (আ.) পুনরায় সেই পথে কাদিয়ানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হুশিয়ারপুর থেকে পাঁচ মাইল দূরে একজন বুযুর্গের সমাধি অবস্থিত। [এখানে সফরকালীন আরো একটি ঘটনাও লেখা হয়েছে।] সেখানে একটি ছোটো বাগান রয়েছে। সেখানে পৌঁছে হুযূর (আ.) কিছুক্ষণের জন্য গরুর গাড়ি থেকে নীচে নেমে আসেন এবং বলেন, **এটি চমৎকার ছায়াযুক্ত স্থান, এখানে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করা যাক।**

এরপর হুযূর (আ.) কবরের দিকে যান আর কথিত আছে, এটি কোনো বুযুর্গের সমাধি। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বলেন, আমিও তাঁর পেছনে পেছনে যাই আর শেখ হামেদ আলী এবং ফতেহ্ খান গরুর গাড়ির কাছেই থেকে যায়। তিনি (আ.) সমাধির কাছে পৌঁছে দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করেন এবং কবরের শিয়রে দাঁড়িয়ে দোয়ার জন্য হাত তোলেন এবং কিছুক্ষণ দোয়া করতে থাকেন। তারপর ফিরে এসে আমাকে সম্বোধন করে বলেন, **আমি যখন দোয়ার জন্য হাত তুলি, তখন এই কবরে সমাহিত বুযুর্গ বের হয়ে আমার সামনে হাঁটু মুড়ে বসেন। আর তুমি যদি সাথে না থাকতে, তাহলে আমি তাঁর সাথে কথাও বলতাম। তাঁর চোখগুলো বড়ো বড়ো এবং (গায়ের) রং শ্যামলা।**

এরপর তিনি (আ.) বলেন, **দেখো, এখানে যদি কোনো খাদেম থাকে তাহলে তার কাছে এঁর অর্থাৎ এই বুযুর্গের বিষয়ে জিজ্ঞেস করো।** বস্তুত হুযূর (আ.) খাদেমকে জিজ্ঞেস করেন। সে বলে, আমি নিজে তাঁকে দেখি নি, কারণ তাঁর ইন্তেকালের প্রায় একশ বছর পার হয়ে গেছে। তবে আমার পিতৃপুরুষের কাছে শুনেছি, তিনি অত্রাঞ্চলের প্রথিতযশা বুযুর্গ ছিলেন এবং এ অঞ্চলে তাঁর গভীর প্রভাব ছিল। হুযূর (আ.) জিজ্ঞেস করেন, **তাঁর শারীরিক গড়ন কেমন ছিল?** সে বলে, **শুনেছি যে তাঁর গায়ের রং শ্যামলা ছিল এবং বড়ো বড়ো চোখ ছিল।** তারপর আমরা সেখান থেকে যাত্রা করে কাদিয়ান পৌঁছি। সে হুবহু সেই

দৈহিক অবয়বই বর্ণনা করে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেছিলেন যে, সেই বুযুর্গ (তাঁর) সামনে এসে বসেছিলেন।

কেউ কেউ বলে থাকে, মৃতদের সাথে বাক্যালাপ হয়; কিছু পুণ্যবান লোকদের, আউলিয়াদের, নবীদের সাথে এভাবেই কথা হয়ে থাকে, কারো কারো সাথে সাক্ষাৎ হয়ে থাকে। এগুলো আল্লাহ্ তা'লার নিজস্ব পদ্ধতি। যাহোক, এই সফর সমাপ্ত হয় এবং তারা কাদিয়ান পৌঁছান। হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রা.) বলেন, আমি এই সফরের ব্যাপারে মিয়াঁ আব্দুল্লাহকে জিজ্ঞেস করি যে, হযরত সাহেব এই নির্জনবাসের যুগে কী করতেন এবং কীভাবে ইবাদত করতেন? হযরত মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ (রা.) উত্তর দেন, এটি আমরা জানি না। কারণ তিনি ওপর তলার কক্ষে অবস্থান করতেন আর আমাদের সেখানে যাবার অনুমতি ছিল না। খাবার প্রভৃতির জন্য আমরা উপরে গেলে অনুমতি নিয়ে যেতাম। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একদিন খাবার রাখার জন্য ওপরে গেলে হযরত সাহেব (আ.) আমাকে বলেন, আমার প্রতি এলহাম হয়েছে, 'বুরিকা মান ফিহা ওয়া মান হাওলাহা'। হুযূর (আ.) ব্যাখ্যা করে বলেন, 'মান ফিহা' অর্থ আমি, অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.); আর 'মান হাওলাহা' অর্থ তোমরা যারা আমার সাথে আছো। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করতেন, আমি তো সারাদিন ঘরেই থাকতাম, শুধু জুমুআর দিন হুযূর (আ.)-এর সাথে বাহিরে যেতাম। শেখ হামেদ আলীও (রা.) অধিকাংশ সময় ঘরেই থাকত। কিন্তু ফতেহ্ খান প্রায় সময় বাহিরে থাকত। আর সম্ভবত এই ইলহামের সময় সে বাহিরে ছিল। এটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের (রা.) ধারণা। মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, সে দিনগুলোতে ফতেহ্ খান হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এতটা ভক্ত ছিল যে, আমাদের সাথে কথা বলার সময় সে বলত, হযরত সাহেবকে আমি নবী মনে করি। আর আমি (মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্) এই কথায় পুরানো বিশ্বাস অনুযায়ী অস্বস্তি বোধ করতাম যে, নবী কীভাবে আসতে পারে? এখন তো নবী আসতে পারে না। কিন্তু ফতেহ্ খান সে সময় তাঁর এতটা ভক্ত ছিল যে, তাঁকে নবী সে সময়ও বলত যখন তিনি (আ.) বয়আতও গ্রহণ করেন নি, কোনো ধরনের দাবিও করেন নি; তিন-চার বছর পূর্বের ঘটনা। কিন্তু যখন সে হোঁচট খেল, মুরতাদ হয়ে গেল। সুতরাং এজন্য সর্বদা মানুষের উচিত নিজের শুভ পরিণামের জন্য (ঈমানের সাথে মৃত্যুবরণ করা) দোয়া করা এবং নিজের ঈমানের দৃঢ়তার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা। আর সেজন্য দোয়াও করতে থাকা উচিত। বিশেষভাবে রমযানে যে দোয়াসমূহ করা হয় তাতে সবার এই দোয়াও করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের পরিণাম শুভ করুন, ঈমান দৃঢ় রাখুন।

মিয়াঁ আব্দুল্লাহ্ সাহেব (রা.) এটিও বলেছেন, একবার আমি খাবার রাখতে গেলে হুযূর (আ.) বলেন, আমাকে খোদা তা'লা এমনভাবে সম্বোধন করেন এবং আমার সাথে এমনভাবে কথা বলেন যে, যদি আমি তার কিছু অংশও প্রকাশ করি, তাহলে যত ভক্ত-অনুরাগী দেখা যাচ্ছে তারা সবাই মুখ ফিরিয়ে নেবে; আর কার্যত এমনটাই হয়েছে। যখন তিনি (আ.) দাবি করলেন তখন কিছু লোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, চরম বিরোধিতা আরম্ভ করে দিয়েছে। কেননা তারা চিন্তাও করতে পারে নি যে, আল্লাহ্ তা'লা এভাবে কথা বলতে পারেন।

একইভাবে নামায পড়ার ব্যাপারে একটি ঘটনা রয়েছে। কিছু লোক নামাযের ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্ন করেন, কীভাবে হাত বাঁধা উচিত আর নামাযের বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি কেমন হওয়া উচিত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ইবাদত কীভাবে করতেন,

নামায কীভাবে পড়তেন– এই ব্যাপারে একটি ঘটনা রয়েছে। মিয়াঁ আলী মুহাম্মদ সাহেব (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামাযের পদ্ধতি বর্ণনা করে বলেন, একবার আমি হুযূরকে সুন্নত নামায পড়তে দেখলাম। ফরযের পূর্বে তিনি (আ.) সুন্নত পড়ছিলেন। হুযূর (আ.) হাত নাভির ওপর বেঁধেছিলেন এবং ডান হাতের মধ্যমা কনুই পর্যন্ত পৌঁছিয়েছিলেন; বরং কিছুটা পেছনে ছিল। সিজদা করার সময় তাঁর দুই হাতের মাঝে কপাল ও নাক মাটিতে রাখতেন। আঙুলগুলো সোজা কা'বার দিকে হতো, হাত এভাবে সোজা থাকত। তিনি (আ.) যখন সিজদা থেকে উঠতেন তখন তাঁর (আ.) পাগড়ি কিছুটা ঢিলা হয়ে পিছনে সরে গেলে আঙুল দিয়ে তা ঠিক করে নিতেন। যাহোক, তিনি এই পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সুন্নত নামায মসজিদ আকসায় তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতার কবরের দক্ষিণ দিকে দাঁড়িয়ে আদায় করেন। আর এরপর ফরয নামায আরম্ভ হয় যা হযরত মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) পড়ান।

অনুরূপভাবে হযরত মুহাম্মদ জামিল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, প্লেগের মহামারি দেখা দেবার প্রারম্ভিক দিনগুলোতে যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পরিবার-পরিজনসহ বাগানে স্থানান্তরিত হয়ে যান, আমরা তখন রাতের বেলা পাহারা দিতাম। আর প্লেগের সময় উন্মুক্ত স্থানে বসবাস করাকেই সমীচীন মনে করা হতো, তাই তিনি (আ.) সেখানে চলে গিয়েছিলেন। রাতে পাহারার সময় আমরা হযরত সাহেবের তাঁবু অতিক্রম করার সময় দেখতাম হুযূর (আ.) নামাযেই মগ্ন রয়েছেন। আল্লাহ্ই ভালো জানেন তিনি (আ.) কখন ঘুমাতেন!

অনুরূপভাবে হযরত চৌধুরী ভাই আব্দুর রহমান সাহেব (রা.) বর্ণনা করেছেন, হুযূর (আ.) তাহাজ্জুদের নামায অত্যন্ত বিগলিত চিত্তে আদায় করতেন। এমনকি ছোটো মসজিদের সম্মুখের কক্ষ থেকেও তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যেত। হুযূর (আ.)-এর রীতি ছিল, **'ইহ্দিনাস সিরাতাল মুসতাকিম'** আয়াতটি বার বার পুনরাবৃত্তি করতেন। অতএব এই দোয়া আমাদেরও বার বার পুনরাবৃত্তি করা উচিত যেন সর্বদা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সত্যপথে প্রতিষ্ঠিত রাখেন।

হযরত মাস্টার নযীর হোসাইন সাহেব (রা.) তাঁর (আ.) তাহাজ্জুদ নামাযের ভাবগাম্ভীর্যের চিত্র তুলে ধরে বলেন, একবার জেহলাম যাবার সময় আমরা লাহোরে আমার দাদা হযরত মিয়াঁ জালালুদ্দীন সাহেব (রা.) মরহুমের বাড়ি **'মুবারক মঞ্জিল'**-এ অবস্থান করি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) রাতে সেখানেই অবস্থান করেন। একটি কক্ষে হুযূর (আ.)-এর ঘুমানোর ব্যবস্থা করা হয়। তিনি বলেন, আমিও সেই কক্ষের বাহিরে বারান্দায় দরজার পাশে শুয়ে পড়ি। রাত প্রায় তিনটায় যখন আমি জাগ্রত হই আর কক্ষের ভেতর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখি তখন তিনি (আ.) নামায পড়ছিলেন। আমিও ওযু করে হুযূর (আ.)-এর পিছনে কিছুটা দূরে নামায পড়া শুরু করি আর আমি হুযূর (আ.) যতটা দীর্ঘ কিয়াম, রুকু বা সিজদা করছেন ততটা দীর্ঘ কিয়াম, রুকু বা সিজদা করার অনেক চেষ্টা করি, কিন্তু তা করতে সক্ষম হই নি। মাত্র দুই রাকআতেই আমি প্রচণ্ড ক্লান্ত হয়ে পড়ি, অথচ হুযূর (আ.) তখনও সেই রাকআতেই ছিলেন যে রাকআতে আমি যুক্ত হয়েছিলাম। অর্থাৎ আমি যে রাকআতে হুযূর (আ.)-এর সাথে যুক্ত হয়েছিলাম তিনি (আ.) সেই রাকআতে কিয়ামেই ছিলেন। তিনি বলেন, অথচ আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি। তিনি বলেন, আমি (তাঁর অনুসরণে) নামায পড়া বাদ দিয়ে নিজের মতো করে নামায পড়া আরম্ভ করি। এটি ছিল তাঁর মনিব [রসূলুল্লাহ্ (সা.)]-এর অনুসরণে তাঁর ইবাদতের এক ঝলক, আর এটি

ছিল আল্লাহ্ তা'লার ইবাদতের দায়িত্ব যথাযথভাবে আদায় করা চেষ্টা। তিনি বলেন, দিনের বেলা যখন আমরা হুযূর (আ.)-এর পাশে বসে ছিলাম আর তিনি (আ.) জামা'তকে তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব বুঝাচ্ছিলেন তখন খাকসার জিজ্ঞেস করি, কেউ যদি তাহাজ্জুদ নামায পড়তে না পারে তাহলে কমপক্ষে কী করা উচিত? অনেকেই জিজ্ঞেস করে থাকেন, তাহাজ্জুদ পড়তে না পারলে কী করা যায়? হুযূর (আ.) বলেন, তখন অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার, আল্লাহ্‌র গুণকীর্তন ও প্রশংসা (তসবীহ ও তাহমীদ) করা উচিত; এতে করে পরবর্তীতে তাহাজ্জুদ পড়ার সৌভাগ্য হবে। তবে এসব দোয়া যেগুলো তিনি (আ.) শিখিয়েছেন– এগুলো তাহাজ্জুদের বিকল্প নয়, বরং এতে তাহাজ্জুদ পড়ার সৌভাগ্য লাভ হবে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবও (রা.) লিখেছেন, [সম্ভবত এটি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবেরই বর্ণনা;] আমার যখন তাহাজ্জুদে অবহেলা হয় তখন আমি [অথবা বর্ণনাকারী] তা অনুসরণ করি আর এতে আমি তাহাজ্জুদ পড়ার সৌভাগ্য লাভ করি। সুতরাং এটি এমন এক ব্যবস্থাপত্র যা অলসতার দিনগুলোতে আমাদের অবলম্বন করা উচিত। আজকাল আমরা রমযান মাস অতিক্রম করছি আর এতে কিছু না কিছু তাহাজ্জুদ আদায়ের সৌভাগ্য লাভ হয়। যদি না-ও হয়, তবুও চেষ্টা করা উচিত। যদিও মসজিদে তারাবীহ পড়ানো হয় এবং এটি বিকল্প হিসেবে হয়, দুর্বল ও অসুস্থদের জন্য বা এমন লোকদের জন্য যারা ভোরে (তাহাজ্জুদের) সঠিক সময়ে উঠতে পারে না অথবা বেশি সময় দিতে পারে না; কিন্তু এটি এমন বিকল্প নয় যা (তাহাজ্জুদের) পূর্ণ অধিকার আদায় করতে পারে।

মহানবী (সা.)-এর সুন্নত এবং তাঁর সত্যনিষ্ঠ দাসের পদ্ধতি হলো, রাতে উঠে তাহাজ্জুদ পড়া। সুতরাং তারাবীহ পড়লেও দুই রাকআত বা চার রাকআত হলেও তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড়া উচিত।

এভাবেই হযরত খায়রুদ্দীন সাহেব বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বসন্তকালে সকাল প্রায় আটটার সময় কাদিয়ান থেকে প্রাতঃভ্রমনের উদ্দেশ্যে বের হন, সেই পথে যা মেনি ও কাদেরাবাদের মাঝখানে অবস্থিত এবং যাকে সড়কও বলা হয়। তিনি (আ.) কাদিয়ানের শেষ সীমানায় দুই রাকআত নফল নামায পড়েন এবং তারপর আমাদের গ্রামের পাশ দিয়ে হেঁটে কাদিয়ানে ফিরে যান। অর্থাৎ প্রাতঃভ্রমনেও তাঁর ইবাদতের খেয়াল ছিল। কাদিয়ানে বসবাসকারীদেরও দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো এর পবিত্রতার খেয়াল রাখা এবং এই জনপদে বসবাদের দায়িত্ব পালন করা, নিজেদের ইবাদতের মান উন্নত করা। কেননা তিনি (আ.) তো কাদিয়ানের ভেতরেও এবং প্রান্তেও নফল ও নামায পড়েছেন।

হযরত মালেক নিয়াজ মুহাম্মদ সাহেব বলেন, ১৯০৪ সালে যখন আমি কাদিয়ান গেলাম, তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) করম দীনের মামলা চলাকালে গুরদাসপুর যাতায়াত করতেন। যখন আমিও সেখানে গেলাম, তখন পুকুরের ধারে একটি ঘরে হুযূর অবস্থান করেন এবং জামা'তের সদস্যরাও সেখানে অবস্থান করতেন; লঙ্গরখানাও সেই অংশেই চালু ছিল। আদালতে আমি দেখলাম, হুযূরের জন্য একটি চাটাই বিছানো হতো এবং হুযূর তাতে বসতেন আর অন্যান্য সদস্যরাও তাতে বসতেন। একটি বড়ো চাটাই ছিল। একটি বিষয় আমি লক্ষ করেছি যা বিশেষভাবে স্মরণ আছে, হুযূরের সর্বদা ওযু করা অবস্থায় থাকার ব্যাপারে। হুযূর যখনই পেশাব ইত্যাদির জন্য যেতেন, তার পরে অবশ্যই

ওযু করে নিতেন, যার ফলে আমি নিশ্চিত হয়ে যাই যে, হুযূর (আ.) সর্বদা ওযু করা অবস্থায় থাকতেন। তিনি 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম' অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে অবিরত পড়তে থাকতেন।

হযরত চৌধুরী ভাই আবদুর রহীম সাহেব বর্ণনা করেন, প্রাথমিক দিনগুলোতে হুযূরের রুটিন ছিল, হুযূর নামাযে সাধারণত সবার আগে মসজিদে উপস্থিত হতেন। একবার আমি সবার আগে পৌঁছার চেষ্টা করলাম, কিন্তু হুযূর সেখানে পূর্ব থেকেই উপস্থিত ছিলেন। হুযূর আকদাস তাঁর যৌবনের একটি অংশ সিয়ালকোটে কাটিয়েছেন যা কমবেশি সাত বছর দীর্ঘ হবে। সেখানে তাঁর যে দিনরাত কেটেছে, তাতে আল্লাহ্‌র প্রতি ভালোবাসা ছিল সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। আর যে-ই বর্ণনা করেছে, সে হুযূরের নির্ভৃত কোণে নির্জনে সময় কাটানো এবং নামায ও তিলাওয়াতে গভীর মনোনিবেশের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছে।

এই প্রসঙ্গে সিয়ালকোটের কয়েকজন এমন ব্যক্তির সাক্ষ্যও আমি উপস্থাপন করছি যারা বিশ্বস্ত ও বুযুর্গ গণ্য হন। হাকিম বদর হুসাইন সাহেব লিখেছেন, এটি তাঁর সাক্ষ্য; যদিও তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যাদিষ্ট হবার দাবির পর আহমদীয়াতের শত্রুদের প্রথম সারিতে চলে গিয়েছিলেন এবং উপন্যাসের আদলে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু ঘটনার ওপর বিদ্বেষপূর্ণ আপত্তিও করেছিলেন; তবে হুযূরের সিয়ালকোট অবস্থানকালের পবিত্র স্মৃতিকে বিরোধিতা সত্ত্বেও ভুলতে পারেন নি। তিনি লেখেন, অত্যন্ত সৌম্যদর্শন [অর্থাৎ মর্যাদাবান চেহারা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী, পরম ধৈর্য ও উচ্চ চিন্তার অধিকারী মানুষ, নিজের গগনচুম্বী মনোবলের বিপরীতে কারো হম্বিতম্বিকে কিছুই মনে করতেন না। ঘরে প্রবেশ করেই ওযুর জন্য পানি চাইলেন; [যেই ঘটনাটি বর্ণনাকারী বলছেন, সেই সময় যে কক্ষে প্রবেশ করেছিলেন– তার কথা বলছেন;] এবং ওযু শেষ করে মাগরিবের নামায আদায় করেন। ওযীফা পাঠরত ছিলেন, অর্থাৎ এরপর যিকরে এলাহীতে রত হয়ে যান।

আবার প্রসিদ্ধ মুসলিম নেতা মৌলভী জাফর আলী খান সাহেবের পিতা, 'জমিদার' পত্রিকার সম্পাদক মুন্সী সিরাজুদ্দীন সাহেব মরহুম বর্ণনা করেন, মির্যা গোলাম আহমদ ১৮৬০ বা ১৮৬১ সালের কাছাকাছি সিয়ালকোট জেলায় মুহুরী ছিলেন। সে সময় তাঁর বয়স বাইশ-তেইশ বছর হবে এবং আমরা চাক্ষুস সাক্ষ্য দিতে পারি যে, যৌবনেও তিনি অত্যন্ত সৎ ও পরহেযগার বুযুর্গ ছিলেন। চাকরির কাজের পর তাঁর সমস্ত সময় ধর্মীয় পুস্তকাদি অধ্যয়নে ব্যয় হতো এবং তিনি জনসাধারণের সাথে কম মেলামেশা করতেন।

একবার হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব সিয়ালকোটে সাইয়্যেদ মীর হাসান সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করেন, যাঁর উল্লেখ আমি পূর্বে করেছি। তিনি অশ্রুসজল নয়নে বলেন, পরিতাপ! আমরা তাঁর সঠিক মূল্যায়ন করি নি; তাঁর মহান আধ্যাত্মিকতার বর্ণনা দেওয়া সাধ্যাতীত বিষয়। তাঁর জীবন সাধারণ মানুষের জীবন ছিল না; বরং তিনি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যারা আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ বান্দা হয়ে থাকেন এবং জগতে কখনো কখনো আগমন করেন।

একটি এমন ঘটনাও আছে যা এক সাধারণ গ্রাম্য মানুষ কীভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নূর উপলব্ধি করেছিল তার সাথে সম্পর্ক রাখে। আল্লাহ্ তা'লার প্রেমিকদের ও মনোনীতদের চেহারা থেকে নূর ঝরে পড়ে।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন, হযরত আম্মাজান বর্ণনা করেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেছিলেন যে, একবার একটি মামলার জন্য আমি ডালহৌসি পাহাড়ে যাচ্ছিলাম, পথে বৃষ্টি শুরু হলো। আমি এবং আমার সঙ্গী এক্কা থেকে নেমে একটি পাহাড়ি মানুষের ঘরের দিকে গেলাম যা রাস্তার পাশে ছিল। আমার সঙ্গী এগিয়ে গিয়ে গৃহকর্তার কাছে ভেতরে আসার অনুমতি চাইল, কিন্তু সে বাধা দিল। ছোট্ট একটি ঘর হবে, গরিব লোকদের ঘর তো এমনই হয়। এতে তাদের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা শুরু হয়ে গেল এবং গৃহকর্তা রেগে গিয়ে গালাগালি করতে লাগল। যখন সে (অর্থাৎ সাহাবী) বলে, আমি আসব, সে (তথা গৃহকর্তা) বলে, আমি আসতে দেবো না, তুই-তোকারি শুরু হয়ে গেল।

হযরত সাহেব বলেন, আমি এই তর্ক শুনে এগিয়ে গেলাম, আর যেইমাত্র আমার ও গৃহকর্তার চোখাচোখি হলো, আমি কিছু বলার আগেই সে মাথা নীচু করে বলল, আসলে আমার একটি যুবতী মেয়ে আছে, তাই আমি অপরিচিত মানুষকে ঘরে ঢুকতে দিই না; তবে আপনি ভেতরে আসতে পারেন।

হযরত সাহেব বলতেন, সে এক অপরিচিত মানুষ ছিল; আমিও তাকে চিনতাম না, সেও আমাকে চিনত না। সুতরাং এটি প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী নূর, পবিত্রতা ও ইবাদতের চিহ্ন ছিল, যা তাঁর চেহারায় সেও দেখতে পেয়েছিল, আর সে বলে, ঠিক আছে, আপনি ভেতরে আসতে পারেন।

আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সর্বদা তাঁর (আ.) সামনে থাকত। কোনো ব্যস্ততা বা কর্মব্যস্ততা তাঁকে যিকরে এলাহীর বিষয়ে তাকে উদাসীন করতে পারে নি। সুতরাং মামলাগুলোতেও আমরা এই আদর্শই দেখেছি; [আমি পূর্বে এমন ঘটনা বর্ণনাও করেছি;] এমন সংবেদনশীল সময়ে যখন মামলা পেশ হচ্ছে, তখন নামাযকে গুরুত্ব দেওয়া ও নামায পড়া একটি কঠিন ব্যাপার হয়ে থাকে। কিন্তু তিনি আল্লাহ্‌র প্রেমে এমন খোদানির্ভর ও নির্লিপ্ত ছিলেন যে, মামলা আদালতে পেশ হয়েছে, যে-কোনো মুহূর্তে হাজিরার ডাক পড়তে পারে, পিয়ন যে-কোনো সময় ডাকতে পারে; কিন্তু নামাযের সময় হতেই তিনি আদালতের ডাক ছেড়ে এবং অনুপস্থিতির পরিণাম সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপহীন হয়ে ঐশী আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হয়ে যেতেন। এটাই সেই আসল বিষয় যা প্রত্যেকের স্মরণ রাখা উচিত; অর্থাৎ নামাযের সময় নামাযকে যে-কোনো অবস্থায় অগ্রাধিকার দিতে হবে। এটি সেই আদর্শ, যা একজন মু'মিনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। তিনি তাঁর মনিব থেকে এটি শিখেছেন এবং এর ওপর আমল করেছেন এবং আমাদের সামনে এই আদর্শ রেখেছেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব অত্যন্ত সুন্দর ভঙ্গিতে তাঁর এই অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তিনি লেখেন, মামলা-মোকদ্দমার এই ধারা অনেক দীর্ঘ ছিল এবং কিছু মামলার অনুসরণ তাঁকে চিফ কোর্ট পর্যন্ত করতে হতো। তিনি লেখেন, আমি এই জীবনচরিতের পাঠকদের হযরত মির্যা সাহেবের জীবনের এই অংশ সম্পর্কে অবহিত করতে গিয়ে যে বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই তা হলো, তাঁর আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক। যারা হযরত সাহেবের সাহচর্যে থাকার এবং তাঁর কথা শোনার সুযোগ পেয়েছেন, অথবা যারা তাঁর প্রকাশিত ভাষণসমূহ পড়েছেন, তারা জানেন যে, হযরত মির্যা সাহেব সর্বদা 'দস্ত বা-কার ও দিল বা-ইয়ার' অর্থাৎ হাত কাজে এবং হৃদয় প্রিয় বন্ধু আল্লাহ্‌র স্মরণে নিমগ্ন– এরই শিক্ষা তিনি দিতেন। মামলায় সাধারণত দেখা যায় যে, বাদী বা

বিবাদী উভয়েই অস্থিরতা ও অশান্তির অবস্থায় থাকে; কিন্তু মির্যা সাহেব যখন মামলার শুনানিতে যেতেন তখন তাঁর মাঝে কোনো অস্থিরতা বা ব্যাকুলতা দেখা যেত না। পূর্ণ স্থিরতা ও গাম্ভীর্যের সাথে 'দিল বা-ইয়ার' হয়ে থাকতেন।

যেখানে এসব মামলা তদারকি ছিল কেবল পিতার আনুগত্যের দায়িত্ব আদায়ের জন্য, সেখানে তিনি এসব মামলার সময় কখনো নামায কাযা করেন নি এবং এভাবে আল্লাহ্ তা'লার অধিকারের সাথে সম্পর্কিত দায়িত্বগুলো পালনে উদাসীন হন নি। খোদ আদালতেই নামাযের সময় এমনভাবে মশগুল হয়ে যেতেন যেন তাঁর আর কোনো কাজই নেই। ঘটনাবলিও তিনি লিখেছেন যে, আদালত থেকে ডাক আসত, কিন্তু তিনি নির্লিপ্ত থাকতেন।

তারপর তিনি লেখেন, মামলার এই সফরগুলোতেও প্রতিটি মুহূর্ত যদি কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ থাকত, তবে তা ছিল সেই সত্তার প্রতি, যিনি মহান স্রষ্টা ও বিশ্বজগতের প্রতিপালক। উদীয়মান সূর্য, রাত্রির আকাশে জ্বলজ্বল করা চাঁদ-তারকা, বহমান ঝরনা ও জলপ্রপাত, সুউচ্চ পাহাড়, প্রবহমান পানি, হিল্লোলিত ক্ষেত-খামার, পাখির কূজন এবং মেঘগর্জন ও বিদ্যুতের শব্দে তিনি একমাত্র সত্তারই প্রতিফলন দেখতেন এবং সেই আলোর উৎসের ঝলক দেখতেন, অর্থাৎ প্রতিটি জিনিসে তাঁর মহিমার বিকাশ দেখতে পেতেন। চারদিকে সেই প্রিয়তম প্রকৃত অস্তিত্বেরই চেহারা দেখতেন। তিনি চাঁদ দেখে যদি অত্যন্ত ব্যাকুল হতেন তবে তা এজন্যই যে, তাতেও প্রিয়তমের সৌন্দর্যের কিছু কিছু নিদর্শন দেখা যেত। সূর্যের প্রস্রবণে তাঁর তরঙ্গ দৃশ্যমান মনে হতো এবং প্রত্যেক তারকায় তাঁর ঔজ্জ্বল্যের ঝলক প্রতীয়মান হতো। সুদর্শন চেহারাসমূহে যে মাধুর্য লুকিয়ে আছে, তা সেই পরম স্রষ্টারই সৌন্দর্যের পরিচয়াক। প্রত্যেক সুন্দর চোখ তাঁকেই দেখায় এবং প্রত্যেক বক্র কেশরাশি সেই এক আল্লাহ্‌র দিকেই ইশারা করে। প্রত্যেক ফুল ও কাননকে তাঁর সৌন্দর্য ও অনুগ্রহের সুঘ্রাণ সুরভিত করে দেয়। অত্যন্ত সুন্দরভাবে তিনি বিষয়টি বর্ণনা করেছেন।

সত্য কথা হলো, বাহ্যত তিনি এসব মামলার জন্য যাচ্ছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সফরগুলোতেও অন্য সবার চিন্তা ও সকল বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত থাকতেন। এই অবস্থার উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, যেমন আমি পূর্বে ডালহৌসি সফরের ঘটনা বর্ণনা করেছি, সেখানেও তিনি সড়কের দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, পানির ঝরনা ও পাহাড়ের সবুজের মেলা কত দৃষ্টিনন্দন!

অতএব সেই এক সত্তায় বিলীনতার অবস্থা প্রতিটি মূহুর্তে তাঁর মাঝে বিরাজমান থাকত। দিন হোক বা রাত, নির্জন অবস্থা হোক বা জনসমক্ষে হোন– সেই সত্যিকার প্রেমাস্পদের স্মরণ কখনো হৃদয় থেকে মুছে যেত না।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, আম্মাজান আমাকে বলেছেন, একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে অথবা আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানিয়েছেন– 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম' বেশি বেশি পড়া উচিত। আম্মাজান বলেন, এ কারণেই তিনি এটি অনেক বেশি পাঠ করতেন। এমনকি রাতে বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্তন করার সময়ও তাঁর জিহ্বায় এই যিকর জারি থাকত। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বলেন, আমি যখন মৌলভী শের আলী সাহেবের কাছে এই রেওয়ায়েত বর্ণনা করি তখন তিনি বলেন, আমিও দেখেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'সুবহানাল্লাহ্' খুব বেশি পড়তেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব

নিজের পর্যবেক্ষণও উল্লেখ করেছেন– আমি সর্বদা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে 'সুবহানাল্লাহ্' পাঠ করতে শুনেছি। তিনি অত্যন্ত ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, ধীর ও প্রশান্ত চিত্তে এবং কোমল স্বরে এই শব্দগুলো উচ্চারণ করতেন। মনে হতো, তিনি যেন পাশাপাশি আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তাও করছিলেন। এরপর তিনি অর্থাৎ হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেছেন, পীর সিরাজুল হক নোমানী সাহেব আমাকে বলেন, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ঘুমের অবস্থা এমন ছিল যে, কিছুক্ষণ পরপর তিনি জেগে উঠতেন এবং ক্ষীণস্বরে 'সুবহানাল্লাহ্, সুবহানাল্লাহ্' বলতে শুরু করতেন, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়তেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী ইরফানী সাহেব লিখেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর প্রিয় মনিব ও নেতা মহানবী (সা.)-এর অনুসরণে নির্জনবাস ও একাকিত্ব খুব পছন্দ করতেন। যদি সম্ভব হতো তাহলে তিনি কখনো বাইরে বের হতেন না। বহুবার তিনি তাঁর বক্তৃতা ও লেখায় একথা বলেছেন। সর্বোপরি তাঁর নিভৃতবাস, কোমল স্বভাব ও নির্জনপ্রিয় প্রকৃতির ওপর যখন গভীর প্রভাব পড়ে এবং তিনি ঐশী আকর্ষণে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার দিকে আকৃষ্ট হন, তখন তিনি তাঁর পিতাকে একটি চিঠি লেখেন। এই পত্র পড়লে বোঝা যায়– তিনি শৈশব থেকেই দুনিয়ার প্রতি বিরাগ এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক দৃঢ় করার চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। যৌবনকালে লেখা এই চিঠি তাঁর পবিত্র স্বভাব ও নির্মল চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। চিঠিটি ফার্সি ভাষায় লেখা। এর একটি অংশে তিনি পিতাকে সম্বোধন করে লিখেছেন, বর্তমান সময়ে আমি নিজ চোখে পরিষ্কারভাবে দেখছি, হৃদয়চক্ষু দ্বারা প্রত্যক্ষ করছি যে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রতি বছর কোনো না কোনো মহামারী দেখা দেয়, যা বন্ধুদেরকে বন্ধুদের থেকে এবং প্রিয়জনদেরকে প্রিয়জনদের থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এমন কোনো বছর দেখি না, এই লেলিহান অগ্নি ও এই মর্মান্তিক ঘটনাগুলো কিয়ামতের ন্যায় ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে না। এই অবস্থাগুলো দেখে আমার হৃদয় দুনিয়ার প্রতি বীতশ্রদ্ধ, ভয়ে মুখমণ্ডল পাণ্ডুর। [বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতিও আমাদেরকে সে কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়– চারদিকে ভয়ানক আগুন দাউদাউ করে জ্বলছে। তাই আমাদের উচিত আল্লাহ্ তা'লার সাথে আরো বেশি সম্পর্ক স্থাপন করা।] তিনি এ চিঠিতে আরো লিখেছেন, প্রায়ই শেখ মুসলেহ উদ্দীন সা'দী শিরাযীর এই দুটি পঙ্‌ক্তি স্মরণে আসে আর কষ্টে ও বেদনায় অশ্রু প্রবাহিত হয়–

মাকুন তাকিয়া বার উমরে নাপায়েদার
মাবাশ আইমান আয বাযিয়ে রোযগার

অর্থাৎ– অস্থায়ী জীবনের ওপর ভরসা কোরো না,
পৃথিবীর এই খেলায় নিজেকে কখনো নিরাপদ মনে কোরো না।
এটা মনে কোরো না যে, আমরা জাগতিকতায় মত্ত, তাই নিরাপদ হয়ে গেছি। সেই সময় তিনি 'ফররুখ কাদিয়ানী' ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। এরপর তিনি লিখেছেন, ফররুখ কাদিয়ানীর এই দুটি পঙ্‌ক্তিও হৃদয়ের ক্ষতে যেন লবণ ছিটিয়ে দেয়–

বাদুনিয়ায়ে দুঁ দিল মাবান্দ অ্যায় নওজাওয়াঁ
কেহ্ ওয়াকতে আজল মী রাসাদ না গাহাঁ

হে যুবক! এই ঘৃণ্য পৃথিবীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়ো না, কারণ মৃত্যুর মুহূর্ত আচমকাই আঘাত হানে। আমি আমার বাকি জীবনটা নিভৃত কোণে কাটিয়ে দিতে চাই। মানুষের সঙ্গ

পরিত্যাগ করে পবিত্র খোদার স্মরণে নিমগ্ন হতে চাই, যেন পূর্ববর্তী ভুলত্রুটিসমূহের সুরাহা করা সম্ভব হয়।

এই দীর্ঘ পত্রটি থেকে বোঝা যায়, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) (জাগতিক) খ্যাতি ও মর্যদার প্রতি লালায়িত ছিলেন না, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে তাঁর একটি স্বচ্ছ সম্পর্ক ছিল। এটি সত্য কথা যে, তিনি (আ.) নির্জনতা ও একাকিত্বকে এতটাই ভালোবাসতেন যে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ বাস্তবায়নের আদেশ না থাকলে তিনি কখনো জনসমক্ষে আসতেন না। তিনি (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা যদি আমাকে নির্জনতা ও লোকালয়ের মাঝে কোনো একটিকে নির্বাচনের অনুমতি প্রদান করেন তবে সেই পবিত্র সত্তার কসম! আমি নির্জনতাকেই বেছে নিতাম। তিনি তো আমাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে কর্মক্ষেত্রে বের করে এনেছেন, নিভৃতচারিতায় আমি যে আনন্দ অনুভব করি তা খোদা ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি প্রায় ২৫ বছর যাবৎ নির্জনতায় জীবন অতিবাহিত করেছি, কখনো এক মুহূর্তের জন্যও খ্যাতির আসনে সমাসীন হওয়া পছন্দ করি নি। প্রকৃতিগতভাবে বৈঠকে সময় কাটানো ছিল আমার কাছে অপছন্দনীয়, কিন্তু আদেশদাতার আদেশের কারণে আমি বাধ্য। এভাবেই তিনি তাঁর পিতাকে পত্র লিখে সবকিছু পরিত্যাগ করেছেন। যেন এক যুবরাজের আসন ছিল যা তিনি (আ.) পরিত্যাগ করেছেন। তাঁর পিতার অধীনে সাতটি গ্রাম ছিল যা তিনি (আ.) কেবল আল্লাহ্ তা'লার ভালোবাসায় পরিত্যাগ করেছেন। কখনো কখনো তিনি (আ.) তাঁর মান্যকারীদেরকেও এ প্রেক্ষাপটে নসীহত করেছেন। একটি ঘটনায় লেখা আছে, মিয়াঁ মুহাম্মদ মূসা সাহেব বর্ণনা করেন, একবার আমি কাদিয়ান গিয়েছিলাম। সেখানে একজন নব্য মুসলমান হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নিকট নিবেদন করেন, হুযূর, আমাকে (বাড়ি যাবার) অনুমতি দিন। [সে অনেক বড়ো জমিদার ছিল।] ফসল কাটার সময় হয়েছে, আমাকে (ফসল) বণ্টন করতে হবে, বর্গাচাষীদেরকে তাদের অংশ প্রদান করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, ফসল কী পরিমাণ? সেই ব্যক্তি নিবেদন করেন, হুযূর, অনেক বেশি! তিনি (আ.) বলেন, আমি তো অনেকগুলো গ্রাম পরিত্যাগ করে খোদা তা'লার পথ অবলম্বন করেছি। আপনি আরো কয়েকদিন এখানে অবস্থান করে নিজের ধর্মীয় অবস্থা উন্নত করুন আর দুনিয়াদারি আল্লাহ্ তা'লার হাতে ছেড়ে দিন, আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহ করবেন।

তিনি (আ.) সেই ব্যক্তির অবস্থা জানতেন বিধায় একথা বলেছিলেন, কিন্তু অন্যত্র তিনি (আ.) বলেছেন, পার্থিব কাজকর্ম সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা উচিত নয়; আল্লাহ্ তা'লা যে পুরস্কাররাজি প্রদান করেছেন তারও মূল্যায়ন করা উচিত। সর্বোপরি সেই নও-মোবাঈকে তরবিয়ত করার জন্য তিনি (আ.) তাকে এই উপদেশ প্রদান করেছেন। তাই এটি পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী হয়ে থাকে। প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থা যাচাই করে দেখা উচিত; পার্থিবতায় এতটা মত্ত হওয়া উচিত নয় যে, একেবারেই তলিয়ে যাবে, আবার পৃথিবীকে এতটাও পরিত্যাগ করা উচিত নয় যে, পৃথিবীর প্রাপ্য যে অধিকার রয়েছে তা-ও পদদলিত হবে। সুতরাং ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা আমাদের অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু একটি বিষয় সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, কোনো অবস্থাতেই আল্লাহ্‌র সত্তাকে পরিত্যাগ করা যাবে না; এক্ষেত্রে সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করা একান্ত আবশ্যক।

এগুলো ছিল তাঁর (আ.) ভালোবাসা, আন্তরিকতা এবং ইবাদতের কতিপয় দিক– যা আমি আজ বর্ণনা করেছি। আল্লাহ্ তা'লা এই রমযানে আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে ইবাদতের সঠিক অধিকার আদায়ের তৌফিক দান করুন, আর আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তাঁর

ভালোবাসায় অগ্রগামী হবার তৌফিক দান করুন; আমরা যেন এই রমযানে সর্বাধিক কল্যাণ লাভ করতে পারি, একইভাবে পরবর্তীতেও যেন এই কল্যাণের প্রভাব আমাদের সাথে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেই প্রকৃত মু'মিন ও একজন আদর্শ মুসলমান হিসেবে গড়ে তুলুন।

এ দিনগুলিতে বিশেষ করে কষ্টে নিপতিত ও মিথ্যা মামলায় জর্জরিত আহমদীদের জন্য অনেক বেশি দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা আহমদী ভাইদের জন্য সবকিছু সহজ করে দিন। মুসলিম উম্মাহকেও দোয়ায় স্মরণ রাখুন। পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা নিষ্পাপ লোকদেরকে এর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন; আর যদি যুদ্ধ ও ধ্বংস অবধারিত হয় তবে আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা নিরপরাধ মানুষদেরকে তা থেকে সুরক্ষিত রাখুন এবং অত্যাচারীদেরকেই ধৃত করুন। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)